CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT

convocation 2021 AGAINST ALL ODDS

the ULABian
A Student Mouthpiece

বিশেষ কোভিড-১৯ সংখ্যা

সমাবর্তন ২০২১ ● পৃষ্ঠা ২

কোভিড নিয়ে নানা আয়োজন ● ভেতরের পাতায়

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, ডিসেম্বর ২০২১, পৌষ ১৪২৮, জামাদুল আউয়াল ১৪৪৩, ৬৮৮, বেরিবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

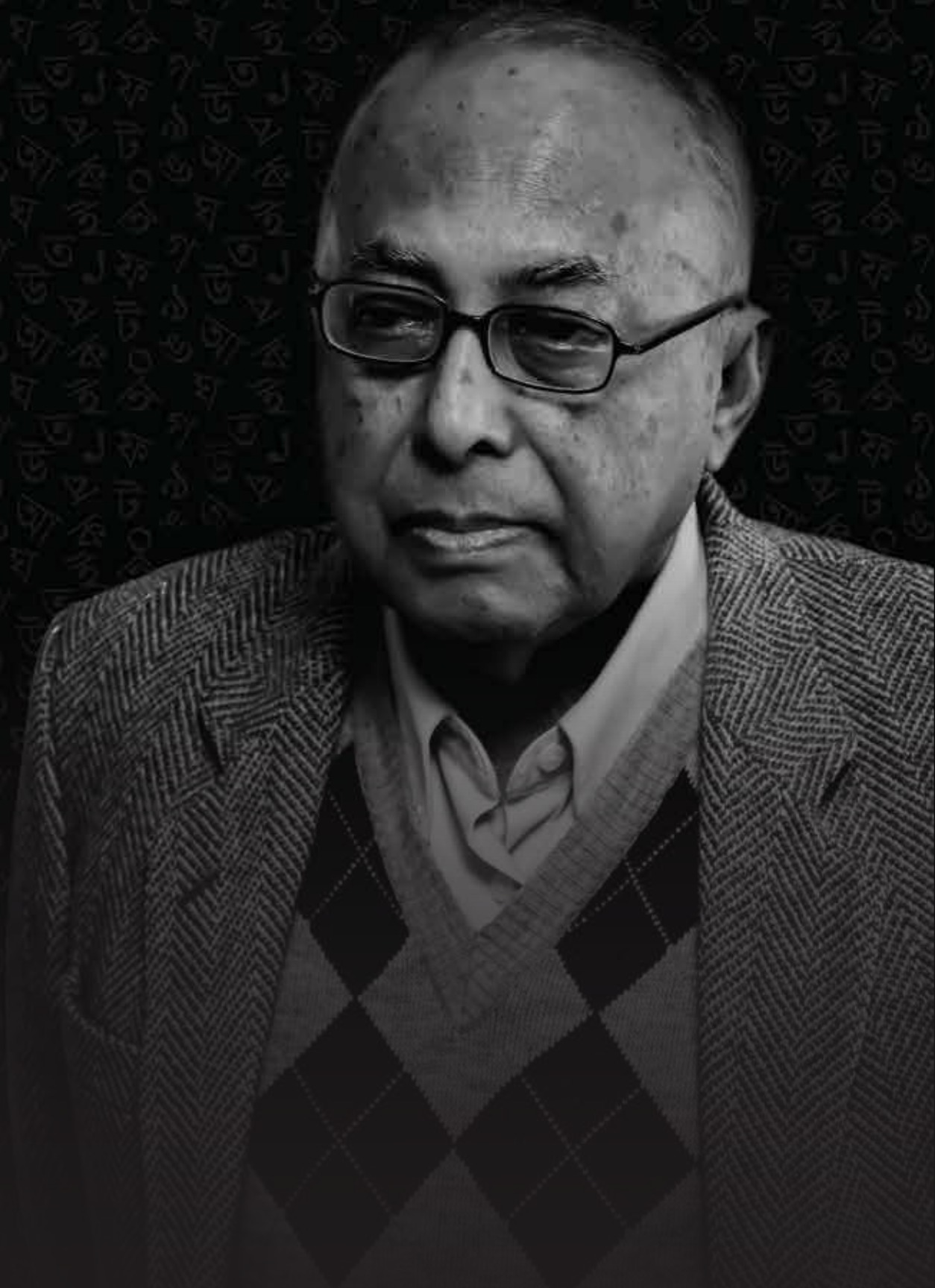

প্রয়াণ শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৩৪, প্রয়াণ: ৩০ নভেম্বর ২০২১

ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

মো. রায়হান কবির শুভ্র

শিক্ষার শক্তির প্রকাশ তখনই পায় যখন এর প্রয়োগ ঘটে। নিজনিজ উদ্দেশ্য পূরণে শিক্ষার্থীরা এ শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন তাদের অর্জনের মাত্রানুসারে। শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক শ্রমে সঞ্চিত এ শক্তির মাহাত্ম অনেকখানি। নিজের সঞ্চয়কে তাই স্পর্শে উপলব্ধি করার আকুলতা থাকে সকল শিক্ষার্থীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের সেই সঞ্চয় ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পান শিক্ষা সমাপ্তির আনুষ্ঠানিকতায় অর্থাৎ সমাবর্তনে। করোনা দুর্যোগের এ কঠিন সময়ে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৭৫৪ জন শিক্ষার্থী তাদের সঞ্চয়কে(সনদ) ছুঁয়ে দেখার সুবর্ণ সুযোগটি পেল বিশ্ববিদ্যালয়টির ষষ্ঠ সমাবর্তনে।

২৯ নভেম্বর ২০২১-এ ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীরা ভার্চুয়ালি জুমের মাধ্যমে যুক্ত হন।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি সভাপতির ভাষণে বলেন, অনুকরণ নয় উদ্ভাবনই শক্তি। গবেষণার প্রতি জোড় দিতে হবে আমাদেরকে। সফট স্কিল এবং মূল্যবোধের সমন্বয় করতে হবে। উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। আপনাদের অর্জন যেন কালো মেঘে ঢেকে না যায়। মাদক এবং জঙ্গিবাদকে না বলতে হবে। আজকে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপ্রাপ্ত হলেন, জাতি গঠনে তাদের দায়িত্ব অনেক। আপনারাই হবেন একদিন এ দেশের রক্ষাকারী। আপনারাই নিয়ে যেতে পারেন লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায়।

ইউল্যাবকে একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে দীপু মনি বলেন, এখানে একজন শিক্ষার্থী বিশেষায়িত বিষয়গুলোর পাশাপাশি লিবারেল আর্টস শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষার সুযোগ পায়। ফলশ্রুতিতে তারা সমাজ-সচেতন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন। পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ার এ ধারণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারায় আমি ইউল্যাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেন, ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সমৃদ্ধ করেনি, বঙ্গবন্ধু ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, কোনো দেশকে উন্নতি করতে হলে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সবার আগে উন্নত করা প্রয়োজন। আজ তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা এবং শিক্ষা-দর্শনকে পাথেয় করেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বাংলাদেশ সংসদের তরুণ সদস্য মাশরাফি বিন মুর্তজার উপস্থিতি।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাশরাফি বিন মুর্তজা সদ্য ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবন অনেক কিছু যেমন দেয়, তেমনি নিয়েও নেয়। তাই সফল হতে সুযোগগুলো কাজে লাগানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষের জীবনে এমন কিছু থাকে না যে চাইলেই সে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু মানুষ মেহনত করতে পারে, চেষ্টা করতে পারে। আমি শিওর, আপনারা এই পর্যন্ত যেভাবে এসেছেন, আপনাদের সেই চেষ্টাটা অব্যাহত থাকবে এবং আপনারা সফল হবেন।

জীবনে কঠিন সময় এলে তাতে ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে রিল্যাক্স করে, আর সহজ সময়ে রিল্যাক্স না করে সময়কে কাজে লাগানোর মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি সব অবস্থায় দেশকে হৃদয়ে লালন করতে স্নাতকদের পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো গবেষণা। এ জন্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ করে দিতে হবে এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। ইউল্যাবের ১০টি গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিশ্বমানের গবেষণা হচ্ছে জেনে আমি সত্যি আনন্দিত।

সমাবর্তনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, ইউল্যাব উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সামসাদ মর্তুজা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিলন কুমার ভট্টাচার্য, রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল (অব.) ফয়জুল ইসলামসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিকাল ৩টায় সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। প্রথম অংশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সমাবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। আপনার লেখা গল্প, কবিতা, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অথবা ছবি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

দ্য ইউল্যাবিয়ান দল: প্রধান উপদেষ্টা: প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো, পিএইচডি, উপদেষ্টা সম্পাদক: বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, সম্পাদক: জান্নাতী ফেরদৌসী মীম, সংবাদকর্মী ও সহযোগী: মো. রায়হান কবির শুভ্র, বিশ্বজিৎ দাস বিজয়, মোঃ আবিদ হাসান সোহাগ, গিবসন মধু এরিক, নাহিয়ান জামাল জয়িতা, মাহযাবীন ইউসুফ, হা-মীম শফিক হোসাইন, মৌমিতা সুলতানা হিমা, সাদিয়া ইসলাম সুপ্তি, খন্দকার মাহিন আরাফাত, সাফায়াত জামিল, তারান্না তাবাসসুম তিয়াশা, সানজিদা ইসলাম সুইটি, নকশা ও অলংকরণ: 'দ্য ইউল্যাবিয়ান ডিজাইনিং টিম'

করোনাকালীন সাংবাদিকতা

তারান্না তাবাসসুম তিয়াসা

পত্রপত্রিকার বড় বড় হরফে কোভিড বিষয়ক শিরোনাম, সচেতনতার পাশাপাশি আতঙ্কিত ছিল মানুষ। ছবি: প্রেসগ্যাজেট

কোভিড-১৯ মহামারি বদলে দিয়েছে কর্মক্ষেত্রের দৃশ্যপট। সময়ের আবর্তনে বদলে গেছে মিডিয়া হাউজগুলোর প্রেক্ষাপট। বেড়েছে দর্শক, সাথে দায়িত্বও। করোনা দুর্যোগের সময় গণমাধ্যমকর্মীরা ছিলেন সামনের সারির যোদ্ধা। তবুও বিভিন্ন সময় সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষার অভাবে সাংবাদিকরা পড়ছেন নানা হুমকির মুখে।

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং, যেকোনো পরিস্থিতিতে সকল ঝুঁকির মাঝেও নিরলস পরিশ্রম করাই সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো তারা সেটা করেও থাকেন। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে যখন সবাই ছিল ঘরে, তখন সংবাদ কর্মীরা ঘুরেছেন রাস্তায় রাস্তায়, সংবাদের খোঁজে। করোনা মহামারি বিগত দুর্যোগগুলোর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। ফলে তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে থাকতে হচ্ছে বেশ সাবধানী।

গণমাধ্যমের ওপর এ সময়টায় মানুষের নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। এজন্য ছোট ভুলগুলোও আর ছোট থাকছে না। অনেকক্ষেত্রে ছোট এ ভুলের জন্য প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমকে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণমাধ্যম ও এর কর্মীদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করা উচিত আমাদের। তাদের কারণেই আমরা বিশ্বের বর্তমান দৃশ্যপট সম্পর্কে জানতে পারছি।

বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী সাংবাদিকতার অনুশীলনে বিশেষ রূপান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোভিড-১৯ সময়কালকে বলা হচ্ছে এ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন সময়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কারোই কোনো প্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কোভিড-১৯ যখন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন উন্নত দেশগুলো আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি পিছিয়ে ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন করোনাভাইরাস বাংলাদেশে আসে, জনসাধারণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের তখন ব্যাপক হিমশিম খেতে হয়েছে।

সাংবাদিকরা নতুন আঙ্গিকে সংবাদ অনুশীলনের প্রশিক্ষণ পায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ভয়াল রূপ ধারণ করার পর। এমআরডিআই-এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এ প্রশিক্ষণ ও করোনাকালীন সাংবাদিকতার জন্য নীতিমালা প্রদান করা হয়। সুরক্ষার অভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছিলেন অনেক সাংবাদিক ও তাদের পরিবার। লকডাউনের শুরুতে সকলক্ষেত্র অচল থাকলেও সাংবাদিকতার চাকা সচল ছিল।

করোনাভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কর্মী ছাঁটাইও করেছে। বাংলাদেশের অনেক গণমাধ্যম তাদের কর্মীদের অব্যাহতি দিয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি ঘটনার আবির্ভাব ঘটেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বলতে হয়, জনগণকে জানাতে প্রয়োজন আরও বেশি গণমাধ্যমকর্মীর। এ সময় গণমাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কমেছে গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন, কেননা এর সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের অস্তিত্ব জড়িত।

সংবাদমাধ্যমগুলো ভোক্তা ও গ্রাহকদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি চালু করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো বর্তমানে এ ধারা অনুসরণ করছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পও টেকসই এমন কোনো মডেল অনুসরন করতে পারে। আমাদের গণমাধ্যমগুলো আর্থিকভাবে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু করোনাভাইরাসের ফলে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান হচ্ছে, তাই বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এমন সময় গ্রাহক ফি আদায়ের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমগুলো স্বনির্ভর একটি ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করতে পারে। গণমাধ্যমকর্মীদের তাহলে টিকে থাকার সংগ্রামে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যুক্ত হবে। তাঁরা কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

সাংবাদিকতা পেশায় প্রাপ্তির চাইতে দানেই অধিক সন্তুষ্টি। অতিরঞ্জিত ও অপ্রয়োজনীয় সংবাদ প্রচার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নয়। এখন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে অপ্রয়োজনীয় সংবাদের চাহিদা বেড়ে গেছে। সুস্থধারার সংবাদের থেকে সেসব সংবাদ গ্রহণেই তারা বেশি আগ্রহী। সাংবাদিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের নৈতিকতার জাগরণ করা।

সাংবাদিকতা এবং ব্যবসা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা। কারও যদি প্রাথমিক চিন্তা থাকে 'আমি বড়লোক সাংবাদিক হব' তার সাংবাদিকতায় না আসাই নিজের জন্য তথা দেশ ও দশের জন্য ভালো। মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে জ্ঞানের প্রসার, সচেতনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি সাংবাদিকদের প্রধান দায়িত্ব।

করোনাভাইরাস অনিশ্চিত একটি কালের সূচনা করেছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা সকলেই সন্দিহান ও চিন্তিত। এ সময় যাঁদের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে প্রথম সারিতে থেকে কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের উদ্বিগ্নতা আরও বেশি। তাই সরকারও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান করছে। চিকিৎসাক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। কিন্তু গণমাধ্যমের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নামমাত্র সহায়তা পাচ্ছে। সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা প্রতিদিন সংবাদ সংগ্রহ করতে ছুটে চলেছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। যারা মানুষের কল্যাণে সর্বদা প্রস্তুত, তাদের প্রতি সরকারকে গণমাধ্যমকর্মীদের জীবন ও সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। সদয় হতে হবে আমাদের।

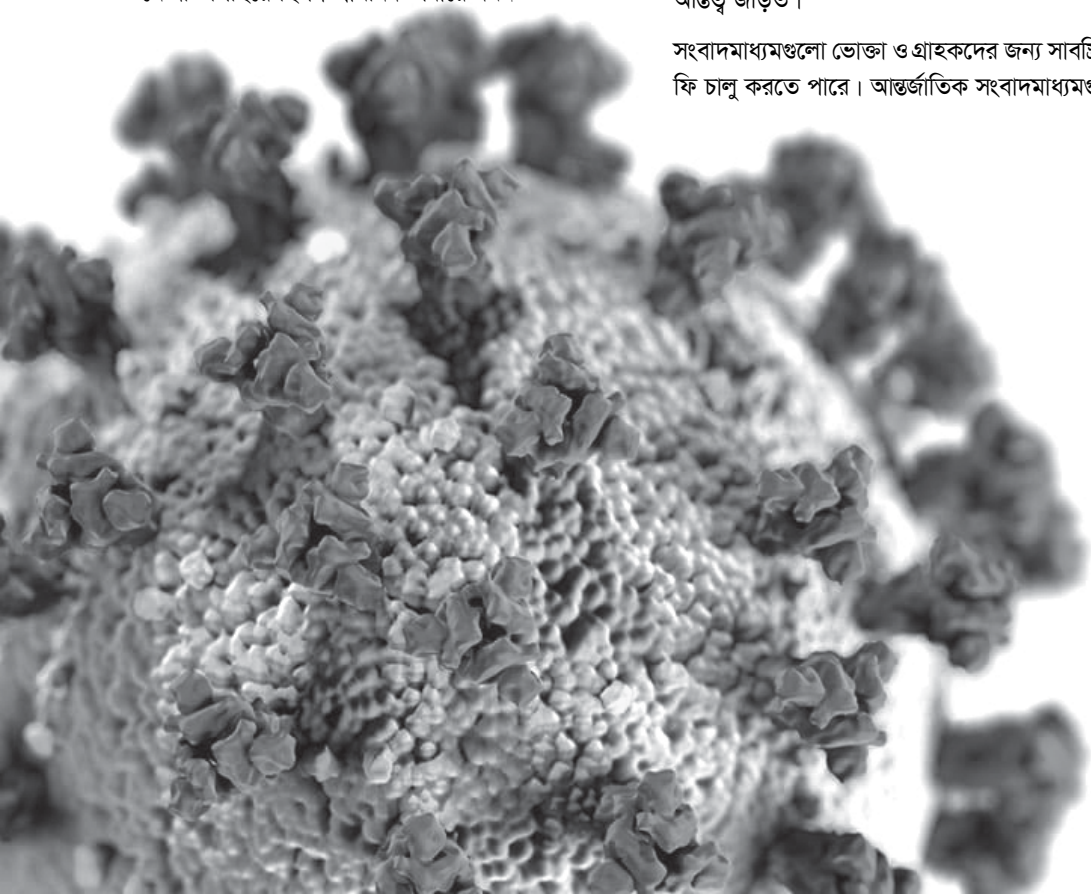

করোনাভাইরাসের ত্রিমাত্রিক কল্পিত রূপ
ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

করোনা ও নতুন জীবন ব্যবস্থা

সানজিদা আক্তার সুইটি

করোনাভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস যা এর আগে কখনও মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। ভাইরাসটি যেহেতু ২০১৯ সালে এসেছে সে জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে কোভিড-১৯ বা নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্বে এরকম আরও কয়েক ধরনের ভাইরাস রয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালে। তখন কেউ জানতো না এটি কী, কোন ধরনের ভাইরাস? কেন মানুষজন আক্রান্ত হচ্ছে? আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের কী ক্ষতি হয় বা কী কী লক্ষণ দেখা দেয়? ধীরে ধীরে ভাইরাসটি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ২০২০ সালের মার্চে। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই বছর ১৭ মার্চ থেকে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম। বদলে যেতে থাকে নিত্যদিনের জীবনচিত্রের প্রেক্ষাপট। শুরুতে খানিকটা থমকে গেলেও অনেকটা বাধ্য হয়েই বদলে যাওয়া এ জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে মানুষ।

সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্পাদন করা শুরু হয়। রাস্তাঘাটে যানবাহন চলাচলও একসময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর ধীরে ধীরে যানবাহনের চলাচল শুরু হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে। সরকারের বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী মানুষজন বাসা থেকে বের হতো বাজার করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর বাজারের সব দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতো। এরকম পরিস্থিতির সাথে কেউই পরিচিত ছিল না বলে প্রথমে সবাই নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু বদলে যাওয়া এ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন অনেকটা টিকে থাকার লড়াইতে সামিল হওয়া মানুষ অভ্যস্ত হতে শুরু করে। শিক্ষা, চাকুরি, বাজার-সদাই থেকে শুরু করে বিনোদনের মাধ্যম খুঁজতে মানুষ নির্ভরশীল হতে শুরু করে অনলাইন ও ডিজিটাল সংস্করণের ওপর।

নতুন জীবন ব্যবস্থার এসব নির্দেশিকা আজকাল চোখে পড়ছে হরহামেশাই

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

সবাই আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু করোনা বিশ্ব থেকে একেবারে চলে যায়নি। কখনও যাবেও না সম্ভবত। স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব মেনেই আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। এদিকে অনেক অপেক্ষার পর করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলেও এখনও কেউ শতভাগ সফল হয়নি। তারপরও ঝুঁকি কমাতে সেসব প্রতিষেধকের ওপরই নির্ভর করে ভবিষ্যতের দিন গুনতে হচ্ছে মানুষকে। আর মেনে নিতে হচ্ছে, টিকা দিলেও প্রাত্যহিক জীবনে সচেতনতার কোনও বিকল্প নেই।

অনেক চিকিৎসক, পুলিশ সদস্য করোনার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন। অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন। এখনও প্রতিদিন অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অনেক মানুষ। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। মৃতুর মিছিলে প্রতিদিনই যোগ হয়েছে নতুন নতুন নাম। তবুও পেশাজীবিদের ঘরে বসে থাকার উপায় কোথায়! নিরপত্তা আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব ধরনের জরুরি সেবার সৈনিকরা তাই সব ভয়কে উপেক্ষা করেই পালন করেছেন অগ্রগামী সৈনিকের ভূমিকা।

অনেক অসাধু ব্যবসায়ী মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, পিপিই-এর মতো জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি-রফতানির সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সব দেশই কমবেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কোনো দেশের ওষুধের মজুদ কমে গেলে বা করোনা প্রতিরোধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি হলে অন্য দেশ থেকে সেসব আমদানির প্রক্রিয়াও নানা রকম বাধার মুখে পড়ছে।

সময় কখনও থেমে থাকবে না। কোনো না কোনো একদিন আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব। করোনা মহামারি আর লকডাউন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। বিপদে অর্জিত এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার কাজে লাগানো যাবে।

কোভিড-১৯ সংকটে গণমাধ্যমের ভূমিকা

তারান্না তাবাসসুম তিয়াসা

করোনাভাইরাস বিপর্যয় মোকাবিলায় গণমাধ্যম সামনের সারিতে থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট, সমাজের সকল অনিশ্চিত সময়েই মানুষ গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য আমাদের চিন্তাভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পারি আমাদের আচরণে।

জীবনের সাথে গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়টা যখন মহামারির, তখন মানুষ গণমাধ্যম থেকেই প্রথম প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাচ্ছে। স্বভাবতই জনসাধারণ গণমাধ্যমের প্রতি আস্থাশীল এবং গণমাধ্যমের দায়িত্ব এ বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা।

গণমাধ্যম ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনে সেতু হিসেবে কাজ করে। সমাজকে আমরা গণমাধ্যমের সৃষ্ট আয়না দিয়ে উপলব্ধি করি। সকল সামাজিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে সেটাও নির্ভর করে গণমাধ্যমের ওপর। কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা - তাও নির্ধারণ করে দেয় গণমাধ্যম। প্রতিটি ব্যক্তির সম্মিলিত আচরণের ফলেই প্রভাবিত হয় সমাজ, তৈরি হয় নতুন চিন্তাভাবনা। তাই সামাজিক জীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও অবদানের কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বর্তমানে করোনাভাইরাস সবার জন্যই ভিন্ন পরিস্থিতি ও সংকটের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ জনগণ জানে না বিশ্বে কী হচ্ছে কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। এমন সময় গণমাধ্যমই পারে আশাবাদী ও সঠিক তথ্য প্রচার করে সবাইকে সচেতন করতে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশিরভাগ মানুষই চিন্তিত। নিরাশা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে অনেকেই ঝুঁকির মধ্যে দিনযাপন করছেন। এ সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদে শব্দের ব্যবহার ও অসম্পূর্ণতা জনমনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

দুঃখজনক ব্যাপার হলেও বৈশ্বিক দুর্যোগের এ সময়েও কিছু স্বার্থবাদী এবং মুনাফালোভী গোষ্ঠী নানাভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। হঠাৎ করেই বাজারে দৈনন্দিন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে পরিমিত পরিমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও। আবার করোনা মোকাবিলার জন্য ফেস মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়ার পরপরই অস্বাভাবিক হারে এর দাম বেড়ে যায়। এমনকি মরণাপন্ন করোনা রোগীর প্রাণ বাঁচাতে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনসহ অন্যান্য চিকিৎসাদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। সাধারণ মানুষ

> দুঃখজনক ব্যাপার হলেও বৈশ্বিক দুর্যোগের এ সময়েও কিছু স্বার্থবাদী এবং মুনাফালোভী গোষ্ঠী নানাভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। হঠাৎ করেই বাজারে দৈনন্দিন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে পরিমিত পরিমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও...

যখন প্রতিনিয়ত এসব তথ্য জানতে থাকে, তখন তারা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়। তারা ভাবতে থাকে ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে, তাই এখনই সবকিছু কিনে রেখে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রয়োজন না হলেও এভাবে অধিকহারে পণ্য কেনার কারণে বাজারে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। বিক্রেতারাও সুযোগ বুঝে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে ভুক্তভোগী হচ্ছে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং অসহায় মানবগোষ্ঠী।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম দ্বারা মানুষের মনোভাব অনন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। কেবল তথ্য প্রচার করাই গণমাধ্যমের দায়িত্ব নয়। এমন কোনো তথ্য প্রচার করা উচিত নয়, যার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উদ্যত হয়। আমার মতে, মানুষের দরকার ছাড়া বেশি বেশি পণ্য কেনার পেছনে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ অন্যতম কারণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে জনগণ কী পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই বিষয়ে গণমাধ্যম সরব ছিল না। কিন্তু যখনই কোনো পণ্যের দাম ও সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে, সে খবরগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়েছে গণমাধ্যমে। যে শিরোনাম মানুষকে প্রথম আকৃষ্ট করে, সেখানেই ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে অসম্পূর্ণ কথা দিয়ে। পণ্যের সংকট ও দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রথমেই নেতিবাচক তথ্য দিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। এজন্য সংকটাপন্ন সময়ে মানুষের অধিকহারে পণ্যক্রয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সমাজে অসম বণ্টন সৃষ্টি করার দায় গণমাধ্যম এড়িয়ে যেতে পারবে না।

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। সংকটাপন্ন অবস্থায় মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অমানবিক কাজটিও অনেক সময় সে করে ফেলে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় যখন লকডাউনের ঘোষণা এল, তখন সকল নির্দেশনা না শুনেই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী পণ্য মজুদ করা শুরু করল। কাঁচাবাজারের শূণ্য ঝুড়ি থেকে সুপারস্টোরের সারি সারি শূণ্য তাকের ছবি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে জনমন আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। উচ্চবিত্ত মানুষেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে যদি সব পণ্য শেষ হয়ে যায়! সে কারণে আগে থেকেই যত বেশি সম্ভব পণ্য কিনে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়।

অন্যদিকে সীমিত আয়ের লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন পণ্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাধ্যের বাইরে চলে গেলে তাদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এজন্য উভয়পক্ষই সাধ্যমতো পণ্য মজুদ করতে থাকে। এ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ভুল হলেও মানুষ গণমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর প্রয়োগ এভাবেই করেছে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা জরুরি।

প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক তথ্য মানুষের মনে অধিক সংবেদনশীলতা তৈরি করে। অনিশ্চিত সময়ে মানুষ নেতিবাচকভাবেই বেশি প্রভাবিত হয়। যেখানে কোনো

▶ বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৩

শিল্পে মধ্যবিত্তের করোনাকালীন বাস্তবতা

জান্নাতী ফেরদৌসি মীম

ভিডিও আর্টের ক্যানভাসে মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সংগ্রাম

ছবি: জান্নাতী ফেরদৌসী মীম

২০২০ সালের মার্চের ঠিক মাঝামাঝি সময়। কোথা হতে শুরু করব বুঝতে পারছি না! হয়তো সেই দুঃসময় নিয়ে ভাবতে চাইছি না। সবাই তখন জীবনঘাতী অদৃশ্য কোনো এক দানবের আক্রমণের শিকার। প্রিয়জনদের চোখের সামনে হারিয়ে ফেলা, তাদের বিদায়বেলায় ছুঁয়ে না দেখতে পারার যন্ত্রণা, অবহেলার দৃশ্য দেখার যন্ত্রণা - এমন অনেক কিছু আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। তবে কিছুই যেন থেমে নেই। জীবন তার নিয়মেই চলছে। কেউ চলে যাচ্ছে, দিন দিন লম্বা হচ্ছে মৃতের তালিকা। না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে দিন পার করছে কেউ কেউ! তার জন্য যেন কারোরই মাথা ব্যথা নেই। এত কিছু দেখার পর, ভাবছিলাম বাসায় বন্দি থেকেও সীমিত সামর্থ আর আয়োজনে কী করা যায়।

করোনাকালীন সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনিরুজ্জামান শিপু স্যারের 'কনভারজেন্স কমিউনিকেশন - ১' কোর্সের মাধ্যমে সুযোগ পাই ভিডিও আর্ট তৈরির। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ সময়টা পার করতে হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে। এ মানুষগুলো যেন পৃথিবীতে এসেছে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য। তারা স্বপ্ন দেখতে চায় না কিংবা দেখতেই ভয় পায়। আমার প্রজেক্ট ছিল করোনা পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে। কেননা তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না, হাত পেতে চাইতেও জানে না। নিম্নবিত্ত মানুষেরা সাহায্য পাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বলতে একটি শব্দ যে আমাদের সমাজে আছে সেটা আমরা প্রায়শ ভুলে যাই। তাই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছিল তাদের না বলতে পারা কথাগুলো ভিডিও আর্টের মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরা। শিল্পের মাধ্যমে চারপাশের মানুষের এ টিকে থাকার সংগ্রামকে ভিডিও আর্টের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা ছিল কাজটি।

আমি আমার প্রজেক্টে নিজেই অভিনয় করেছিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মেয়ের ভূমিকা ছিল সেটি। শুরুতেই দেখা যায়, মেয়েটি চারপাশকে ঘিরে কালোরঙের বেড়াজাল দিয়ে সেই সাথে তার পা দুটি তালাবদ্ধ করে শেকল দিয়ে আটকে দিয়েছে। এর মাধ্যমে করোনা সময়ের বন্দি অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছি। এরপর মেয়েটি তার সামনে রাখা খাবারের পাত্রগুলোর ঢাকনা তুলে খাবার খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোনো খাবার না পাওয়ার ফলে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। মেয়েটি তার মুঠোফোন ব্যবহার করে সাহায্য চেয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে বার্তা পাঠাতে চায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষগুলো তো সাহায্য চাইতে কুণ্ঠাবোধ করে। তাই মেয়েটিও শেষমেশ সাহায্য চাইতে পারেনি। ক্ষুধায় মেয়েটি পেটে হাত দিয়ে কাতরাচ্ছে। নিজেকে বন্দি করে চাবিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে। তা না হলে তাকে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে ঘরের বাইরে পা ফেলতেই হবে। ঠিক এমনি ছিল আমার ভিডিও আর্টটি।

আমার মতে শিল্পীর মধ্যে শিল্পবোধ যেমন জরুরি, তেমনি অবশ্য প্রয়োজন সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে যে হাহাকার, যে আর্তনাদ, আমি চেয়েছিলাম কিছুসংখ্যক মানুষের কাছে সে বিষয়টি তুলে ধরতে। চেয়েছি আমার এ শিল্পকর্মটির মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে ভাবাতে। করোনা আক্রান্ত বিশ্বে টিকে থাকার লড়াইতে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম নিয়ে সামান্য হলেও আলোকপাত করতে। ভিডিও প্রদর্শনীর পরে আমি যতটা ফিডব্যাক পেয়েছি তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি আমার চিন্তাভাবনা দিয়ে মানুষের মাঝে কিছুটা হলেও সাড়া জাগাতে পেরেছি। করোনাকালীন সময়ে এটা ছিল আমার কয়েকটি কাজের মধ্যে অন্যতম ভালো লাগার একটি কাজ।

করোনাকালের ভাষা ও আমরা

তারান্না তাবাসসুম তিয়াসা

কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, পিপিই, লকডাউন - এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু বছরখানেক আগেও কি আমরা এগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম? উত্তর না-ই হওয়ার কথা। করোনাকালীন শব্দগুলো করোনা ভাইরাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের টেলিভিশন, মোবাইলের স্ক্রিন কিংবা পত্রিকার পাতায়। যেন অপরিচিত শব্দের পরিচিত মিছিল।

ভাষায়ও রয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রভাব। মহামারির এ সময়ে ফিরে এসেছে অনেক পুরাতন শব্দ, সংযোজন হয়েছে নতুন শব্দের। আমরা অনেক ভাষার অনেক শব্দই ব্যবহার করছি, যার অর্থ সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। অনেক শব্দের অস্তিত্ব আগে থেকে থাকলেও তার প্রচলন ঘটে পরিস্থিতি অনুযায়ী। একসময়ের জনপ্রিয় ভাষার ধরন ও শব্দ বদলে যায় নতুন সময়ের আগমনে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সে যুগের ভাষার ধরন জানা অপরিহার্য। করোনাভাইরাস এমনই ভিন্ন এক পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে আমাদের জীবনে। মানুষের জীবনধারার সাথে ভাষা ও শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে বিশেষভাবে। করোনাকালে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব ভাষা ও শব্দ বেশি ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার মাঝে কিছু হলো-

করোনাভাইরাস, ভেন্টিলেশন, পিপিই, শ্বাসকষ্ট, কোভিড-১৯, রেস্পিরেটর, জনসচেতনতা, নভেল করোনা, আইসোলেশন, ফেস মাস্ক, এন৯৫ মাস্ক, মেডিকেল মাস্ক, কোয়ারেন্টিন, হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার, গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, হাসপাতাল, আক্রান্ত, সংকট, মহামারি, আতঙ্ক, লকডাউন, কমিউনিটি স্প্রেড, করোনা পজিটিভ, ইনফেকশন, গ্রাউন্ড জিরো, পেশেন্ট জিরো, উহান, চিকিৎসা, চিকিৎসক, নিরাপত্তা, টেস্ট, ভ্যাকসিন, প্রতিরোধক, স্বাস্থ্যকর্মী, সংক্রমণ, প্রাদুর্ভাব, সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, জনসচেতনতা, ইমিউনিটি, ক্লিনিকাল ট্রায়াল, করোনা আপডেট, ইনকিউবেশন, পিরিয়ড/সুপ্তকাল, আউটব্রেক, স্ক্রিনিং, স্প্যানিশ ফ্লু, হাঁচি-কাশি, জরুরি অবস্থা, অক্সিজেন, সরবরাহ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, উপসর্গ, দ্রুত বিস্তার, নীতিমালা, নিষেধাজ্ঞা, প্রবাসফেরত, সামাজিক দূরত্ব, রেডজোন, রেড এলার্ট, স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, ভার্চুয়াল মিটিং, পরামর্শ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

এ শব্দগুলোর ব্যবহার আমাদের জীবন ও চিন্তাভাবনার জগৎকে নতুনত্ব দিয়েছে। মানুষকে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত রাখতে ও সবাই যেন নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে সে জন্যই এসকল শব্দের পুনঃসংযোজন হয়েছে প্রায় সব মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে আমরা অহরহ এর প্রতিফলন দেখতে পাই। এত অল্প সময়ে এতগুলো শব্দের আবির্ভাব বা পুনরাবির্ভাব আমাদের ভাষার জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এসব শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান

▶ বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

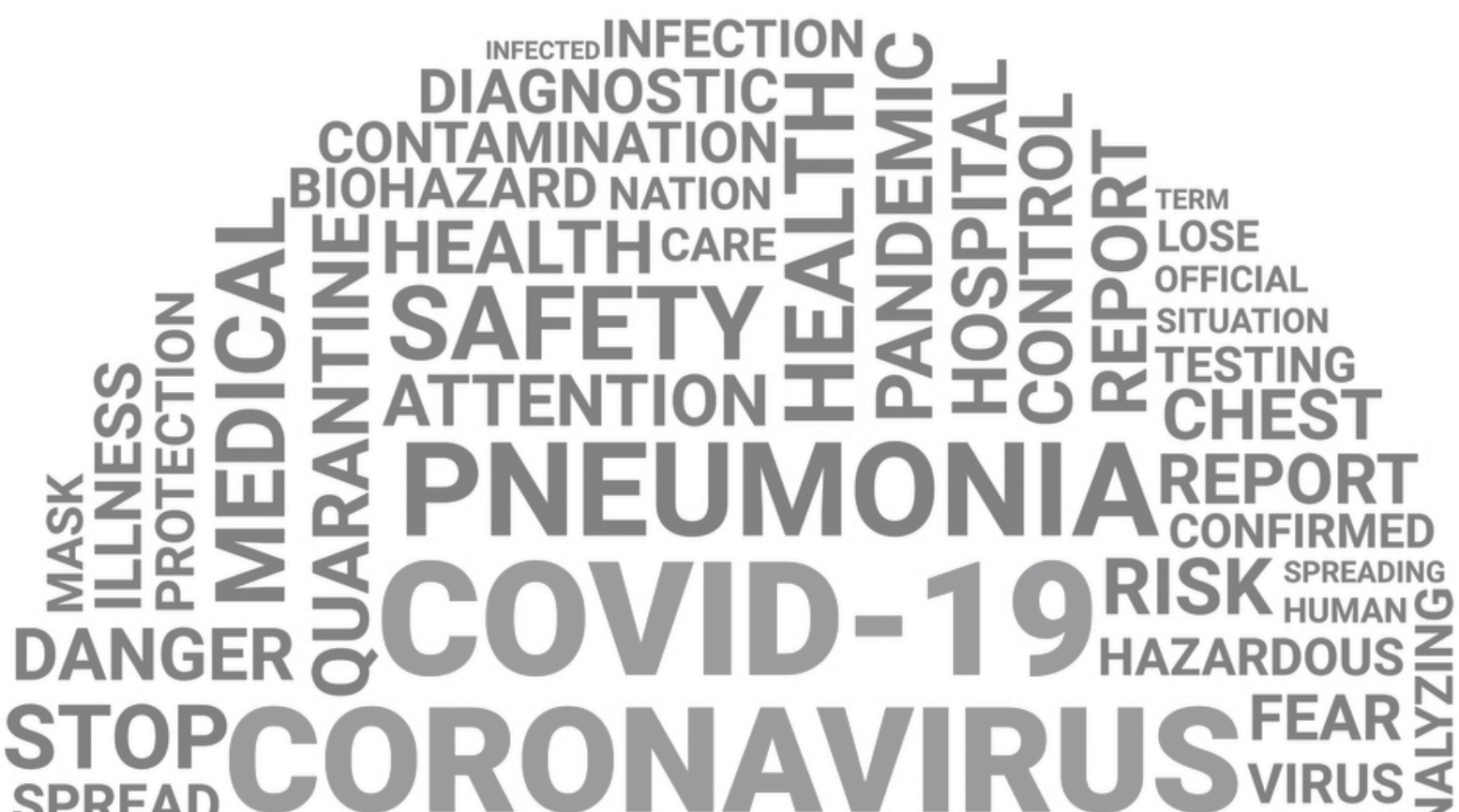

যেন ফিরে যাচ্ছি আপন নীড়ে

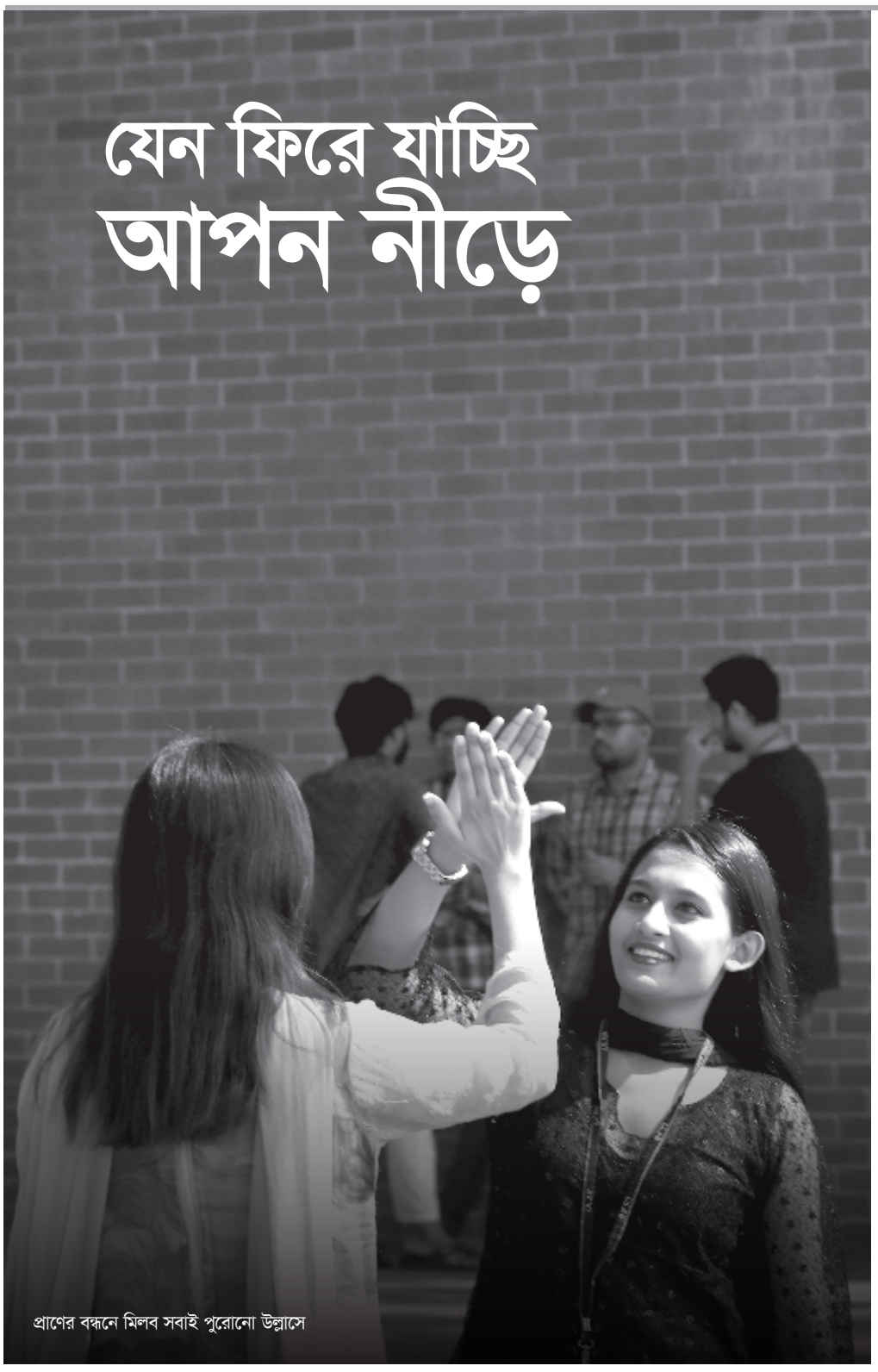

প্রাণের বন্ধনে মিলব সবাই পুরোনো উল্লাসে

জান্নাতী ফেরদৌসি মীম

করোনাকালীন দীর্ঘ একটা দুঃস্বপ্নের পথ পাড়ি দিয়েছি। প্রতিদিনের মতো নিয়ম করে ক্যাম্পাসে পা রাখতে হয়নি। হুট করে পেছন থেকে বন্ধুরা এসে জড়িয়ে ধরেনি। হাত থেকে চায়ের কাপ কেড়ে নিয়ে চুমুক দেয়নি। একসাথে জড়ো হয়ে লাইন ধরে বাসের সিটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্যান্টিনে খাবার প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা টংঘরে হুড়োহুড়ি করে চা, সিঙারা খাওয়া হয়নি। এ মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝে খুব বিরক্তিকর মনে হতো। সিগারেটের ধোঁয়াটে টং ঘরে যেতে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতো। ভয়ানক জ্যাম পেরিয়ে ক্লাস করতে যাওয়াটা একসময় যতটা খারাপ লাগতো, করোনা এসে সবকিছুকে বদলে দিয়েছে। বরং এখন সেই জ্যামে জটে ঘামে ভেজা শহর আর শহরের মানুষগুলোকেই যেন খুব বেশি মিস করছি।

দীর্ঘ অপেক্ষা, কবে ফিরে যাব প্রাণের আঙিনায়! অনেকটা জ্যাম পাড়ি দিতেও যেন রাজি আছি। টং ঘরের সিগারেটের ধোঁয়ার অস্বস্তিবোধটা বোধ হয় আর নেই। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে ছোট ছোট কুকুরছানাগুলো ঘুরে বেড়াতো। না জানি ওরা এখন কত বড় হয়ে গেছে! ওদের সাথেও তো কত গল্প করা বাকি ছিল! প্রাণের সেই গোলচত্বরে আবারও সবাই মিলে উল্লাসের গান গাইব। কেউ সুরে, কেউ বেসুরো গলায় তৈরি করবে অদ্ভুত এক ঐকতান। গিটারের সুরের সাথে প্রকৃতির রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আবারো টংঘরে সিঙারা হাতে গল্প জমে উঠবে। চায়ের কাপে লেগে থাকবে শত অভিমান। হুট করে বন্ধুরা এসে কোকের বোতলটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটে সবুজের মাঝে মিশে যাবে। ক্লাসে লেকচার শুনতে শুনতে ক্লান্তি চলে আসলে জানালা থেকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকব দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে। লাল আগুনজ্বলা ফুলগুলো ক্লান্তি কাটিয়ে সতেজতা এনে দেবে প্রাণের মাঝে। হয়তো সেই প্রিয় বড় আপুটির সাথে আর দেখা হবে না। খুঁজে পাব অপরিচিত কিছু জুনিয়র ভাই বোনের মুখ। নিজেকে তখন সেই বড় আপুর মতো অনেক দায়িত্ববান মনে হবে। ওদের মন খারাপের গল্প শুনব, কঠিন লেকচারগুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেব। সময়ের অদ্ভুত পালাবদলে নিজেকে আবিষ্কার করব একটা নতুন মোড়কের আদলে।

প্রাণের প্রিয় শিক্ষকদের কথা আর ডিভাইসের মাধ্যমে শুনতে হবে না। শুনতে হবে না ভিডিও বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা! সময় এলে এবার উল্টো ল্যাপটপ, মোবাইলগুলো কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়ে দেব। বেরিয়ে আসব এতদিনের যান্ত্রিক জীবনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে। গিটার হাতে দুরন্ত যে বন্ধুটা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মাঠের মাঝে ঘুরে বেড়াতো, ওকেও ক্লাসের এক কোনায় দেখতে পাব। ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্রটাও মনোযোগ দিয়ে ক্লাসের লেকচার শুনবে। আগে যে বিষয়গুলো ছিল খুব অপ্রিয়, অদ্ভুত এক মনস্তাত্ত্বিক রসায়নে সেগুলোকেই যেন একটু বেশিই মিস করছি আমি, কিংবা আমার মতো সবাই। প্রিয় জিনিস ফিরে পাওয়া একটা অন্যরকম অনুভূতি, সেটা হয়ত ক্যাম্পাসের ব্যস্ত সময়ের মাঝে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারি ক্যাম্পাস, আড্ডা, জীবন, স্বপ্ন সবকিছুই একে অপরের সাথে গাছের শিকড়ের মতো আটকে থাকে। নিত্যদিনের সেসব প্রিয়-অপ্রিয়গুলোকে হারিয়েই যেন গভীর হচ্ছে মনের ক্ষত।

প্রকৃতির ছায়ায় ঘিরে থাকা ক্যাম্পাসে যেদিন ফিরে যাব সেদিন যেন করোনাকে জয় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি। খোলা মাঠে যেন দম ফেলে ছুটতে পারি, বন্ধুদের আলিঙ্গন করতে পারি, শিক্ষকদের স্নেহের পরশ পেতে পারি। আর লাল উঁচু দালান, ক্লাসের চেয়ার-টেবিলগুলো যেন ছুঁয়ে দেখতে পারি। এতটুকুই তো আকাঙ্ক্ষা।

প্রাণের স্পন্দন হারানো ক্যাম্পাস আর করিডোর ফিরে পাবে তার হারানো সৌন্দর্য

করোনার ঘেরাটোপে অনেকটা এমনই হয়ে ওঠে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ *ছবিসূত্র: ইন্টারনেট*

করোনাকালের ভাষা ও আমরা

▶ পৃষ্ঠা ৭ এর পর

পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার অনন্য এক পদ্ধতি তৈরি করেছি আমরা। যেমন- আগে ভাইরাস, স্বাস্থ্যবিধি, নীতিমালা ইত্যাদি শব্দ শুনলেও আমরা খুব একটা চিন্তা করতাম না। কিন্তু এখন এ শব্দগুলোই আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি আকর্ষণে সবচেয়ে এগিয়ে। বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো এখন আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়ের মূলেও এখন এ শব্দমালার আনাগোনা থাকে, যা আগে ছিল না।

ঐতিহাসিকভাবে সংকট এবং জরুরি সময়কাল শক্তিশালী শব্দ নিয়ে আসে মানবজীবনে। আঠারো শতকে যক্ষ্মা বা কলেরার মহামারি এবং বিংশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ এর উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম দুঃসময়ে ভাষা এবং শব্দ মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বিশেষ কিছু শব্দ আমাদের মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে। কখনও এসব শব্দ আমাদের মনে ভয় জাগায়, আবার কখনও আশার সঞ্চারণ করে। বারবার আশঙ্কা, মহামারি, জরুরি অবস্থা, আক্রান্ত, মৃত্যু - এ শব্দগুলো শুনলে অজান্তেই বিপদের কথা ভেবে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। আবার সুরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাভাবিক, করোনাজয় - এ শব্দগুলো আমাদের মনে নতুন দিনের অনুপ্রেরণা জোগায়। এজন্য শব্দের ব্যবহারে বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত গণমাধ্যমকর্মীদের। পরিস্থিতির ভয়াবহতা জনগণের কাছে এমন ভাষা দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে যেন কেউ মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে।

যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারি এবং পুরো বিশ্বে ছড়িয়েছে, তাই এর সম্পর্কে প্রচারে চিকিৎসা বিষয়ক এবং বিদেশি শব্দ বেশি ব্যবহার হচ্ছে। কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, লকডাউন শব্দগুলো যখন প্রথম প্রচার শুরু হয় অনেকেই সে সময়ে করণীয় কী তা জানত না। তাই নিজের অজান্তেই তারা নিয়ম অমান্য করে আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। এ অবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পারি, এসব বহুল ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের সঠিক প্রয়োগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ শব্দগুলো বাংলায় যদি সকলের বোঝার মতো করে ব্যবহার করা হতো, যেমন- ঘরে থাকুন, আলাদা থাকুন, বাইরে বের হওয়া মানা, তাহলে হয়তো সর্বস্তরের মানুষের বোধগম্য হতো।

কোভিড-১৯ সংকটে...

▶ পৃষ্ঠা ৫ এর পর

নিশ্চয়তা নেই সেখানে সাহস, যুক্তি ও সুবিবেচনার ঘাটতি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে।

করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচার করা উচিত নয়। ভীতিসঞ্চার ছাড়া ইতিবাচকভাবেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাংবাদিকদের এমনভাবে সংবাদ প্রচার করতে হবে যেন তা সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে। অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে জনপ্রিয়তা লাভ সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নয়। অনিশ্চিত সময়ে রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবাদের প্রতিটি শব্দ জনমনে কী প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বর্তমান সময়ে শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে গণমাধ্যমের সহজলভ্যতার জন্য সর্বস্তরের মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। তাই দুর্যোগে সাংবাদিকদের শুধু সঠিক সংবাদ প্রচারে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, দুর্যোগ মোকাবিলা ও করোনা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার উপদেশও দিতে হবে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমতা বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা যাবে না। এমনভাবে সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে যেন সাধারণ মানুষের মনে ভীতিসঞ্চার না করে। গণমাধ্যম মানুষকে উদ্বিগ্ন করতে পারে, আবার এ উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তির পথও তৈরি করে দিতে পারে। গণমাধ্যমের দায়িত্ব কিন্তু দ্বিতীয়টি, প্রথমটি নয়।

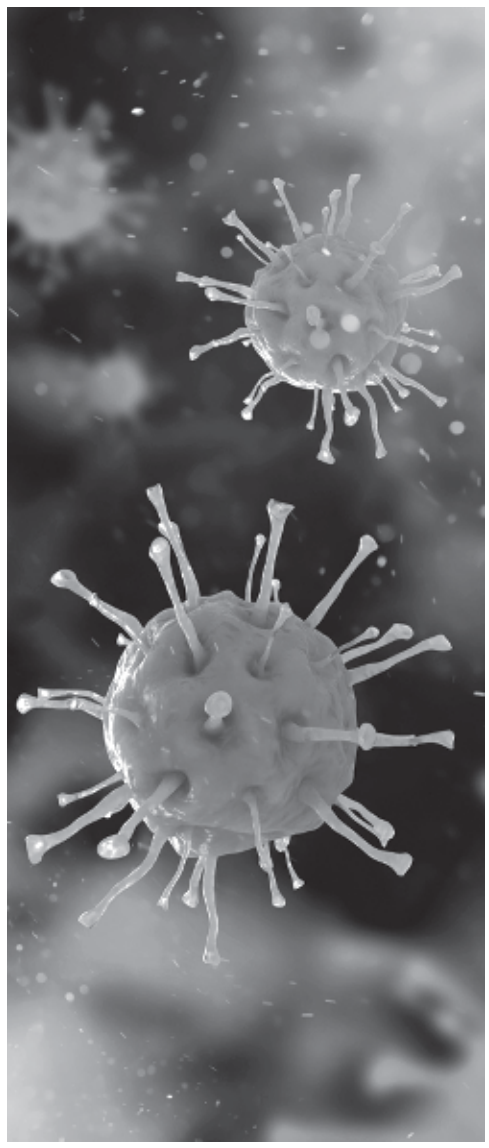

কম্পিউটার গ্রাফিকসের ত্রিমাত্রিকতায় করোনাভাইরাসের কাল্পনিক চিত্র *ছবিসূত্র: ইন্টারনেট*

করোনার শব্দ ধাঁধায় বাঁধা পড়ছে মানুষ

জান্নাতি ফেরদৌসি মীম

ভাষা হচ্ছে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। নদী যেমন চলার পথে বাঁক নেয় তেমনি ভাবে অনাদি কাল থেকে ভাষা ও তার শব্দ পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি এবং শব্দের নিত্য নতুন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ভাষার গতিবিধি বদলে যাবার নানা চিরন্তন উপায় বেশ সময়সাপেক্ষ। সে তুলনায় আধুনিক যুগে গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে ভাষারীতির পরিবর্তন কিংবা ভাষায় নতুন শব্দসংযোজনের যে প্রক্রিয়া তা অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত। পাশাপাশি শব্দ জানার কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে। ঠিক এ মুহূর্তে পুরো বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত মহামারির সম্মুখে। আর তাকে ঘিরেও জমে উঠেছে অদ্ভুত এক শব্দের ধাঁধাঁ।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এসেছে ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এ মহামারির সম্মুখীন হয়ে মানুষ যতটা না আতঙ্কিত হয়েছে, বরং তার থেকে বেশি আতঙ্কিত গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত নতুন নতুন ভাষা ও শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হতে গিয়ে। মহামারিকে ঘিরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে- প্যান্ডেমিক, আইসোলেশন, সেল্ফ আইসোলেশন, লকডাউন, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, কমিউনিটি স্প্রেড, পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট), মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স, কোমরবিডিটি, ইমিউনিটি বিশেষভাবে আলোচিত। এ শব্দগুলো বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে একেবারেই নতুন। তাই শুরুর দিকে নতুন সংযোজন হওয়া এ শব্দগুলোর বিষয়ে জনমনে লক্ষ্য করা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কাউকে যেমন দেখা দেছে শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে পেতে ক্লান্ত হতে। কেউ কেউ আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এদিক সেদিক চোখ বুলিয়ে ভুলভাল একটা অর্থেই নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে।

‘করোনাভাইরাস’ শব্দটি যখন প্রথম বাংলাদেশে আসে তখন মানুষ বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শব্দটির সাথে পরিচিত ছিল না বলে। এরপর আসে ‘লকডাউন’ শব্দটি, যেটির সাথে খুব বেশি মানুষ পরিচিত ছিল না। বাঙালি কারফিউ মানে খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু তারই সমার্থক শব্দ ‘লকডাউন’ যেন একেবারেই অপরিচিত সবার কাছে। এ লকডাউন মানে যে একবারেই নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলা, সেটা আমাদের দেশের অধিকাংশ নিম্ন আয়ের মানুষের বোঝা ও জানার বাইরে।

> মহামারির সম্মুখীন হয়ে মানুষ যতটা না আতঙ্কিত হয়েছে, বরং তার থেকে বেশি আতঙ্কিত গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত নতুন নতুন ভাষা ও শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে। মহামারিকে ঘিরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে- প্যান্ডেমিক, আইসোলেশন, সেল্ফ আইসোলেশন, লকডাউন, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, কমিউনিটি স্প্রেড, পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট), মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স, কোমরবিডিটি, ইমিউনিটি বিশেষভাবে আলোচিত

ভাষা ও শব্দ কীভাবে আমাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে সেটা বোঝাতে আরও একটি উদাহরণ দিতে চাই। যদি ‘ভেন্টিলেটর’ শব্দটির কথা বলি, এটা আমাদের অনেকের কাছে একেবারেই অপরিচিত। কিংবা অনেকেই শুনে মনে করতে পারে ঘরের কক্ষের ভেন্টিলেটরের কথা বলা হচ্ছে, যেটা দিয়ে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। জটিল এ শব্দগুলো না বুঝতে পারাটাই স্বাভাবিক। খুব কম সংখ্যক মানুষ ভেন্টিলেটর সম্পর্কে জেনে থাকবেন। কোভিড-১৯ এ যে ভেন্টিলেটরের কথা বলা হয়েছে তার সহজ মানে হচ্ছে অবাধে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের শারীরিক প্রক্রিয়া, বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করার প্রক্রিয়া।

এসব অজানা শব্দ ও ভাষা মানুষের জীবনযাপনে ও আচার আচরণে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কারণ এ মহামারিতে যখনই আমরা কোনো সংবাদপত্র পড়ি কিংবা টেলিভিশনে সংবাদ দেখি, তার অধিকাংশই কোভিডকে কে ঘিরে। এ সংবাদগুলো এবং সংবাদে ব্যবহৃত শব্দগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নানা প্রভাব বিস্তার করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির বিষয়টি যে কার্যকর হয়ে ওঠেনি তা বলা উচিত হবে না। কিন্তু তার পাশাপাশি কোভিড বিষয়ে শঙ্কা সৃষ্টির ও প্রবল মানসিক চাপ তৈরির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে এমনটাও লক্ষ্য করা গেছে হরহামেশা।

করোনায় সংকটে কোয়াল সম্প্রদায়

মামুর হাত ধরি এ পেশায় আচ্চি, হামার পাড়াত মুই একন একলাই এই পেশাত আচং। ছেলে দুকনে নাপিতের কাজ করে। করোনা ফরোনা মরার উপরত খারা ঘাউ হইছে, করোনার জন্যে এখন আর আগের মতো কামাই ওজগার নাই। সবাই আগ্রহ হারাই ফেলচে। করোনা হামরাগুলে বুঝি শ্যাষ হয়া যামো বাহে, কাই বাচাইবে হামাক?

মহামারি করোনায় গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় অন্যান্য পেশাগুলোর মতো বিলুপ্ত প্রায় কোয়াল পেশাকেও বিপর্যস্ত করেছে। কোয়ালিরা মূলত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গবাদিপশুর রোগবালাই সারাতে মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন। গোয়াল ঘরে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং গাছান্ত ওষুধ দিয়ে গৃহস্থের কাছ থেকে প্রণামি হিসেবে ধান-চাল কিংবা গম নিয়ে আয়ের সংস্থান করেন। লকডাউনের কারণে কোয়ালিরা গত কয়েক মাস ধরে কার্যত গৃহবন্দি, বন্ধ হয়ে গেছে আয়। এ পেশার সাথে জড়িত অনেকেই বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছেন। আর যাদের সে উপায়টুকুও নেই তারা কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

চলমান এই বৈশ্বিক মহামারির আগেও উত্তরবঙ্গে এ কোয়ালিদের সরব উপস্থিতি ছিল। তারা হিন্দু-মুসলিম সবার বাড়িতেই যেতেন। কাঁধে বড় থলে নিয়ে সকাল থেকেই ছুটে চলতেন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। থলের একদিকে থাকে গাধার পিঠে বসানো সিঁদুর মাখানো শীতলা দেবির মূর্তি। এই মূর্তিকে বসন্তবুড়ি বা গোরখনা বলা হয়। আর থলের অপর প্রান্তে থাকে একটি ডালা, যাতে থাকে গৃহস্থের বাড়ি থেকে উঠানো ধান-চাল। কোয়ালিরা ঘরের দরজার সামনে বসে কাঁসার মন্দিরা বাজিয়ে পুঁথি পাঠের সুরে গরুর মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন। এ গানে মূলত গোরক্ষনাথের মাহাত্ম প্রচারিত হয়। পাশাপাশি এ গীতের মধ্যে থাকে গৃহস্থ বাড়ির রমণীদের উদ্দেশ্যে কিছু সাবধান বাণী। যেমন:

'সকাল বেলা হয়ে যেবা গোবর ফ্যালায়,
গোরক্ষনাথ ওই গোয়ালেতে বার মাস রয়।
গোবর ফ্যালিয়া যেবা বেড়ায় মোছে হাত,
ছয় মাসের গর্ভ গাভির হয়ে যায় পাত।
শনিবারে মঙ্গলবারে হলদি বিলায়,
তাহার ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া পালায়।
গোয়াল ঘরে গিয়া যদি ঝাড়িয়া বান্দে চুল,
তাহার ঘরের গরু-বাছুর করে ঢুলা ঢুল।
গোবর নাড়িতে যেবা করে ঘিনা ঘিন,
তাহার গইলের গরু টেকে অল্পদিন।'

মহামারিতে এ অঞ্চলে কোয়ালিদের তেমন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কাজ হারানো মানুষগুলো কোথায় গেছে জানে না কেউই।

জেলা সমাজসেবা অধিদফতরের উপ-পরিচালক এমদাদুল হক প্রামাণিক বলেন, 'এই পেশা বিলুপ্তির জন্য শুধু করোনা মহামারি দায়ী নয়। উপজেলা সদরে এখন পশু চিকিৎসালয় হয়েছে। মানুষ এখন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক সচেতন। তাছাড়া আগের মতো আর গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান নেই কৃষকের ঘরে।'

কোয়ালিরা জানান, এখনও যারা এ পেশা আকড়ে ধরে আছেন তা শুধু মায়ার টানে। সাঘাটার পাচিয়ারপুর গ্রামে কথা হয় সম্ভুনাথ কাপালির সাথে। তিনি বলেন, 'মামুর হাত ধরি এ পেশায় আচ্চি, হামার পাড়াত মুই একন একলাই এই পেশাত আচং। ছেলে দুকনে নাপিতের কাজ করে। করোনা ফরোনা মরার উপরত খারা ঘাউ হইছে, করোনার জন্যে এখন আর আগের মতো কামাই ওজগার নাই। সবাই আগ্রহ হারাই ফেলচে। করোনা হামরাগুলে বুঝি শ্যাষ হয়া যামো বাহে, কাই বাচাইবে হামাক?'

লেখা ও ছবি:
মো. রায়হান কবির শুভ্র

কোভিডে অর্জন

জান্নাতী ফেরদৌসী মীম

ইচ্ছা শক্তির ডানায় ভর করে সকল বাধা-বিপত্তিকে পদাঘাতে সরিয়ে এগিয়ে যাবার নামই তো জীবন। জীবন তো তাই থেমে থাকার নয়, জীবন এগিয়ে চলার। ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরাও থেমে থাকেনি। তারা স্বপ্ন দেখেছে নতুন দিনের, আশায় বুক বেঁধেছে সোনালি ভোরের! তাদের আজকের সাফল্যে আলোকিত হয়েছেন তারা নিজেরা, আগামীর সাফল্যে আলোকিত হবে পৃথিবী। কবি সুব্রত নন্দী যথার্থই লিখেছেন:

ইচ্ছাই শক্তি, ইচ্ছাই মুক্তি,
ইচ্ছার কাছে নত সকল বাধা বিপত্তি।

সমাবর্তন ২০২১

সমাবর্তন ২০২১

সমাবর্তন ২০২১

সমাবর্তন ২০২১

সমাবর্তন ২০২১

সমাবর্তন ২০২১